প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

অন্য স্বাদের গল্পে অন্যকথা : জলধর সেন

দীপন দাস

Abstract

Jolodhar Sen is such a short story writer in whose stories the picture of the contemporary period has emerged. In this article I have tried to show how in the stories 'Pagal', 'Poran Mandal', 'Nasiber lekha' 'Bichar' etc. this very picture springs up.

কথাসাহিত্যের জগতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাঙাল হরিনাথের শিষ্য জলধর সেনের আবির্ভাব ঘটে। সাহিত্যের আসরে সেই মত হাতেখড়ি 'গ্রামবার্তা'তেই হয়। তবে ছোটগল্পের জগতে জলধর সেন তেমন জনপ্রিয় না হলেও 'হিমালয়' (১৩০৬), 'হিমালয়-বক্ষে' (১৩১১), 'হিমাদ্রি' (১৯১১) রচনার মাধ্যমে পাঠক মহলে 'হিমালয়' ভ্রমণ কাহিনির লেখক রূপেই অধিকবেশি পরিচিত হয়ে ওঠেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাজ করার সুবাদে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড়তা উত্তরোত্তর বেড়েছে। বিশেষত 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'সুলভ সমাচার', ভারতবর্ষ' নামের পত্র-পত্রিকাতেও আমরা তারই অজস্র দৃষ্টান্ত পেয়ে যাই।

জলধর সেনের গল্পগ্রন্থের সংখ্যার বিচারে দেখলেও বলা যায় তাঁর লেখনীর ধারাবাহিকতা। এগারোটি গল্পগ্রন্থের প্রায় নব্বইটি গল্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এরই অজস্র দৃষ্টান্ত। অন্যান্য গল্পের তুলনায় যদিও মুসলমান সমাজ জীবনকে নিয়ে লেখা তাঁর গল্পের সংখ্যা সেই তুলনায় একটু কম। কিন্তু মুসলমান সমাজ-জীবনকে গল্পের পট-পরিস্থিতি অনুযায়ী বর্ণণা করে তিনি বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম্য জনজীবনের সুখ-দুঃখকে নিয়ে বিশুদ্ধ প্রেম রসের আবহে এই সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তুলে ধরেছেন। এবিষয়ে ড. সুকুমার সেনও মনে করেছেন – "জলধরের রচনায় বিশেষ গুণ সারল্য ও স্বচ্ছতা। পল্লীগ্রামের দরিদ্র ভদ্রজীবনের আর্থিক ও সামাজিক দুঃখ বেদনা ইহার গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বস্তু।"[১] তাই বিষয় অনুযায়ী দেখলেও বিচিত্রতার নিদর্শন লক্ষ করা যাবে-

১। 'পাগল' (১৯০০, ১৩ই অক্টোবর) 'নৈবেদ্য' গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয় – গল্পের বিষয় মুসলমান যুবক আমির মন্ডলের ইন্দুর রূপতৃষ্ণায় পাগলে পরিণত হওয়া। একদিকে মুসলমান যুবকের প্রেম অন্যদিকে বাউল মন-মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দেখা গেছে।

২। 'পরাণ মন্ডল' – (১৯১৪, ১লা সেপ্টেম্বর) 'পরাণ মন্ডল ও অন্যান্য গল্প' –

ভ্রাতৃপ্রেমের অটুট বন্ধন ও স্ত্রীকে হত্যা করে জেল খাটার প্রসঙ্গ।

৩। 'নসীবের লেখা' - (১৯১৪, ১লা সেপ্টেম্বর) 'পরাণ মন্ডল ও অন্যান্য গল্প' - জমিদারের ষড়যন্ত্রে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়ার কাহিনী।

৪। 'বিচার' - (১৯১৬, ১০ই আগষ্ট) 'আর্শীবাদ' গল্পগ্রন্থ - হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবটি উল্লিখিত হয়েছে, এখানেও বাউল গানের ব্যবহার দেখা গেছে।

৫। 'মহামায়ার মায়া' - (১৯২০, ১৯ই আগষ্ট) 'কাঙ্গালের ঠাকুর' - হিন্দুর গৃহাঙ্গনে মুসলমান ফকিরের আগমন ও মুসকিল আসানের গান শোনা গেছে।

পটভূমির বিচারেও জলধর সেনের ছোটগল্পের চরিত্ররা উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করেছে। কেননা অর্থনৈতিক দিকটি গল্পচরিত্রের প্রেক্ষাপটকে ঘিরেই রচিত হয়েছে। লেখক স্বয়ং নিজে যেহেতু মেদিনীপুর জেলায় কর্মসূত্রে কিছুকাল অতিবাহিত করেছেন তাই তিনি নিজেও গল্পের পটভূমি রচনায় গ্রাম্য সমাজ জীবনকে বেছে নিয়েছেন। যেমন ---

ক।। 'পাগল' গল্পের চরিত্র ইন্দুর মা ফিরে আসে হরিপুর গ্রামে --

"পল্লিগ্রামের গৃহস্থ ঘরের অন্তঃপুরবদ্ধা নহেন। ... পল্লিগ্রামের দৃশ্য-বৈচিত্রের মধ্যে আসিয়া, পল্লিবাসিনী মধুরহৃদয়া রমণীগণের সাহচর্য ও অকৃত্তিম সহানুভূতি লাভ করিয়া ক্রমে তাহার হৃদয় সংযত হইয়া আসিল।"[২] এরপর গল্পের কাহিনিও ক্রমশই পরিবর্তিত হয়েছে।

খ।। 'পরাণ মন্ডল' - মামুদপুর গ্রামের মুসলমান পরিবার। এখানেও দেখা গেছে - "মামুদপুর গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই বাস। গ্রাম খানিও নিতান্ত ছোট নহে। গ্রামে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক।"[৩]

গ।। 'নসীবের লেখা' - গল্পে স্বরূপগঞ্জের লেঠেল সর্দারকে দেখা গেছে। সাধু সেখ পেশায় একজন লেঠেল সর্দার একাই সতের জনের মাথা ফাঁটিয়ে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করে নিজেই আবার থানায় গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। সেই সাধু সেখই জমিদারের কথানুসারে সংসারী হয়েছে। কিন্তু তার পেশাগত লাঠিখেলা, দাঙ্গার পরিবর্তে সে স্ত্রীর কথায় - "শ্বশুড়ের লাঙ্গল গরু লইয়া চাষের কার্যে"[৪] মন দেয়। চরিত্রটি এমন বিবর্তিত অবস্থায় কেউ সাধু সেখকে লাঠি খেলার কথা বললে প্রত্যুত্তরে বলেছে-- "সে সব গঙ্গাপারে রেখে এসেছি, ও কর্ম আর না।"[৫]

খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই চরিত্রগুলি যে সমাজ পরিবেশ থেকে এসেছে তা গল্পবিচারে প্রাসঙ্গিক হয়েছে। সমাজ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে জলধর সেন দেখিয়েছেন ব্যক্তি চরিত্রেরা কিভাবে বিবর্তিত হয়ে গেছে।

উল্লেখিত গল্পের মধ্যে 'নসীবের লেখা', 'বিচার' এবং 'মহামায়ার মায়া' গল্পে নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে হিন্দু জমিদারদের আমরা পেয়েছি। সামাজিক প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটের আলোকে আমরা এও দেখেছি হিন্দু জমিদারের মুসলমান লেঠেল সর্দারকে, যে দীর্ঘ দিন থেকে কর্মে বহাল ছিল। ১৯১৪-১৯২০ এই সময় পর্বের বিচারেও দেখা যায় অখণ্ড বঙ্গের বুকে জমিদার শ্রেণির প্রভূত প্রভাব-পতিপত্তি। তবে ইতিহাসের বিচারে ১৯১৯-১৯২২ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির স্বর্ণযুগ চলছিল। পারস্পারিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রটা এই সময় ঐক্যবদ্ধভাবে মিলিত হতে সহায়তা করেছিল। নেতা নেত্রীদের একতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সুস্থিতির বাতাবরণ গড়ে উঠলেও ১৯২১-১৯২৪ এই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। জলধর সেন এই সন্ধিক্ষণে যে কয়েকটি মুসলমান চরিত্রকে দেখিয়েছেন তারা হিন্দু জমিদারের কর্মে নিযুক্ত থেকেছে। তবে

ব্যক্তিক্রমের মধ্যে 'পাগল' এবং 'মহামায়ার মায়া' গল্পের ফকির চরিত্রটি।

সামাজিক অবস্থানের বিচারেও গল্পগুলির প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে এসেছে ভিন্নতর দিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার ভগ্নরূপ, মুসলমান কৃষক পরিবারের কাহিনি এসেছে (পরাণ মন্ডল) বিভিন্ন গল্পে। একইভাবে জমিকে কেন্দ্র করে সমস্যা, জমিদারের অত্যাচার, দাঙ্গাহাঙ্গামা, পাইক লেঠেল সর্দারকে দাপটে দরিত্র-প্রজারা নিশ্চুপে কালাতিপাত করেছে। স্বরূপগঞ্জের দাঙ্গার পর শান্তিতে বসবাসের জন্য সাধু সেখও (নসীবের লেখা) শেষে কৃষকে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সাধু সেখের চারিত্রিক বিবর্তন নিঃসন্দেহে তার জীবনকে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। তার মৃত্যুর পর জমিদারই সাধু সেখের স্ত্রী-পুত্রকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করার ব্যবস্থা নিয়েছে। রক্ষকই শেষপর্যন্ত ভক্ষকে রূপান্তরিত হয়েছে। এভাবেই বিপর্যস্ত কৃষক পরিবার সবকিছু হারিয়ে পথে নেমে এসেছে।

'বিচার' গল্পের ছলিম সর্দারও দীর্ঘ দিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী। জমিদারের হয়ে খাজনা আদায় করতে গিয়ে নিজের আত্ম সংযম বজায় রাখতে পারেনি। হিন্দু পরিবারের বিরুদ্ধে সে দুর্ব্যবহার করলেও তার প্রতি ক্ষমা দৃষ্টি মানবিকতাকে জয়ী করেছে। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক, ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজের কথাকেই লেখক এগল্পে নিয়ে এসেছেন।

অখণ্ড বঙ্গের ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে আমরা হিন্দু জমিদারের বিশ্বস্ত এমন বহু মুসলিম একনিষ্ঠ সেবক কর্মীর পরিচয় পেয়ে যাবো। এ বিষয়ে হুমায়ুন কবীর 'মুসলিম পলিটিকস' গ্রন্থে বলেছেন, "খাজনা আদায়কারী মুসলিম প্রধানত মধ্যসত্বভোগী রূপে সংখ্যায় যথেষ্ট ছিলেন" (বিপিন চন্দ্র, পৃঃ ৬৫)। তৎসমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতেও এটা ছিল একটা দিক। আমরা মুসলমান সমাজ চরিত্রের অনুসন্ধানেও দেখেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক দুর্বলতা মুসলিম চরিত্রদের এমন জীবিকা গ্রহণ তাড়িত করেছিল। ইংরেজ প্রধানত ভারতবর্ষে মুসলিমদের ইংরেজ বিরোধী প্রবল বিদ্বেষ-বিরোধিতাই তাদেরকে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে বিমুখতা, এবং ধর্মনৈতিকতার অপপ্রচারে মুসলিম জন-জাতির জীবনাচারকে ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই অর্থনৈতিক বিপর্যয়তার চিত্র এই সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

ছলিম সর্দার জমিদারের হয়ে হরিনাথের গৃহ থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসতে চায়নি। তাই সে টাকা না নিয়ে উঠতে চায়নি। তর্কে-বিতর্কে জমিদার নায়েবের কথা পালন করতে গিয়ে কঠোরতার সঙ্গেই বলেছে, "সে সব আমি জানিনে; নায়েব মশাই বলেছেন, যেমন করে হোক আজ খাজনার টাকা আদায় করতেই হবে।" (বিচার, পৃঃ ১৫০) উত্তেজনা ও বাদানুবাদের দরুণ ছলিম সর্দার অপ্রিয়উক্তি করে ফেলে - "তোর পনেরো বছরের বোনটা আছে, তাকে নায়েব" (বিচার, পৃঃ ১৫৩) প্রজা এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। নায়েবকে সামনে দেখেও অপমানের জালায় মনের কথাটি ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ছলিম সর্দার নিজের কৃতকর্মে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে। সে যে অন্যায় কাজ করেছে তা তার শারীরিক ভাষাতেই প্রমাণিত হয়েছে, "ছলিম সর্দার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল" (বিচার, পৃঃ ১৫৪)। সুতরাং অপরাধবোধ ও ক্ষমা যে মানুষকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে স্থাপিত করতে পারে, ছলিম সর্দারকে ক্ষমা করার মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়েছে। হরিনাথ বিচারকের আসনে থেকে ছলিমকে ক্ষমা করেছে এবং গল্পের ভাবসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা বঙ্গদেশে জমিদারের প্রভাব, তথা নায়েবের ভয়ানক রুদ্র রূপের অনেক পরিচয় পেয়েছি; ভয়াবহ সেই পরিণতিও দেখেছি। কিন্তু এই গল্পে নায়েব স্বাভাবিক ভাবেই প্রজাদরদী

এবং সুবিচারক ও ন্যায়মূর্তি স্বরূপ হয়েছে। কে হিন্দু কে মুসলিম একথার গুরুত্ব দেননি। বিশেষত ছলিম পুরনো কর্মী হলেও নায়েব তার প্রতিও দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি ছলিম সর্দারের কাজের প্রসঙ্গে নিজের পুত্রের সঙ্গে তুলনা এনেছেন। তাই বিচারকের আসনে তিনি ন্যায়ের আদর্শ সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হিন্দু-মুসলিম অসাম্প্রদায়িকতার অটুট বন্ধন এ গল্পে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক ভিত্তি ও তার মতাদর্শগত রাজনৈতিকতার একটা প্রভাব ছিল; বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকেই তা পরিলক্ষিত হয়েছে। শোষক শ্রেণির ভেতরে ভেতরে অর্থনৈতিক দোলাচলতা ছিল; ফলত সুবিধাভোগীরা নিজেদের স্বার্থ কায়েমে এই ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তবে এই সমস্যা থেকে নিরসনের পথ খুব কম লেখকই বলতে পেরেছেন। জলধর সেন সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। তিনি হরিনাথের মধ্যস্থতায় শান্ত স্নেহরসের সুধায় ছলিম সর্দারকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন ---

"সর্দারের পো, ভাই অমন ক'রে কি কথা বলতে
আছে? যে মুখে হরিনাম
করতে হবে, আল্লার নাম করতে হবে বলে এত
দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছি,
সে মুখ দিয়ে কি তুচ্ছ কথা বার করতে হয়
ভাই! তুমি মুসলমান হলেও
আমার দয়াল হরির দাস।" (বিচার, পৃঃ ১৫৪)

এভাবেই গল্পটিতে সামান্য মুসলমান চরিত্রের উপস্থিতি আমাদের নিয়ে গেছে বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে। জমিদারের স্বরূপগত দিক, হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী মনোভাব, এবং বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্রণে অজানারে আমরা এভাবেই জানতে পেরেছি।

'মহামায়ার মায়া' গল্পে ফকির বেশে যে চরিত্রটি এসেছে তা স্বল্পস্থায়ী। অবস্থা সম্পন্ন হিন্দু পরিবারের আর্থিক বিপর্যয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে লেখক মুসলমান ফকির চরিত্রের মুখেই মুশকিল আসানের কথা শুনিয়েছেন ---

"ইয়া পির মত্তলা মুশকিল আসান, যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।"[৬]

এভাবেই বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতাকে লেখক প্রয়োগ করেছেন। বিশেষত বৈষ্ণবীয় প্রেম রসের আলোকে জলধর সেন রূপের মোহে আচ্ছন্ন হওয়া প্রেমকে দেখিয়েছেন। তবে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভাবনায় একটা সময় পর্যন্ত যেরূপ উত্থান-পতন ও সমাজপতিদের তীব্র আপত্তি ছিল তা বিশ শতকের সমাজ সমস্যার তীব্রতাকেই প্রমাণ করেছে, যা ফল্গুস্রোতের মতই আজও বহমান। জলধর সেন প্রাসঙ্গিক ভাবেই আমির মন্ডলের (পাগল) মুগ্ধ বধির চিত্র পটকে এনেছেন এবং পরিণতিতে শ্মশান চিতার ভস্মভূমিতে নিয়ে গেছেন মুগ্ধতার বেশে 'হায় আল্লাম, হায় আল্লা'[৭] গভীর শোকের মধ্যেই সে কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যতা রয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলিম দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে অনৈক্য মনোভাব দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকেই এবং তা আজও আছে। কেননা প্রতিটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি কখনও এক ছিল না। 'নববধূ', 'আল এসলাম'-এ উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ বিষয়ে সেদিন প্রবল আপত্তি করা হয়েছিল। হিন্দু কি মুসলিম কোন ধর্ম কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই এই সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে মেনে নেয় নি। 'পাগল' গল্পের আমির মন্ডলের ইন্দুর প্রতি প্রেম-ভালবাসা থাকলেও সেখানে সামাজিক সংস্কারই বড় বাধা হয়েছে। বসিরদ্দি মন্ডলের উনিশ বছরের পুত্র আমির মন্ডল সে তো খেঁজুর গাছ কাটতে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মন হারিয়ে এসেছে। অথচ অন্তরের এই কথা কাউকে সে বলতে পারেনি। গল্পকার আমিরের যন্ত্রণা কাতর মনের হদিস দিতে গিয়ে বাউলের গানের মাধ্যমেই বলেছেন –

"একদিনও না দেখিলাম তারে

আমার ঘরের কাছে আরনিশনগর,
তাতে এক পড়শি বসত করে।”[৮]

কিন্তু দরিদ্র ঘরের পিতা-মাতা আপন পুত্রের এমন মতিচ্ছন্ন অবস্থাকে মেনে নিতে পারেনি। চেষ্টা চালিয়েছে পুত্রের আশু অবস্থার পরিবর্তন করতে। গ্রাম্য সংস্কার ও উপাচারে চলেছে সেই ব্যবস্থাও, পিরের দরগা থেকে ঝাড় ফুক, মন্ত্র-তন্ত্র সবই। তবে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। নিশিদিন চুপটি করে দুই হাঁটুর মাঝে আমির উৎস্যুকতার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থেকেছে। আত্মমনের বোঝাপড়া শেষ হতেই শেষে মনের মানুষের সন্ধানে মুখোপাধ্যায়দের বাড়ির উঠোনে উপস্থিত হয়েছে। মুখের দেখা মিলবে এই আশাতেই ইন্দুর কাছে আজ্ঞাবাহকে পরিণত হয়েছে। আবার ইন্দুর অসুস্থতায় আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছে –

“হে আল্লা, আমার এই আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন প্রাণের অবলম্বনকে রক্ষা কর।”[৯]

এই ভাবনায় আমির চরিত্রটিকে সামাজিক বাধা বিঘ্নের উর্ধ্বে নিয়ে গেছে। মানুষের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার অটুট বন্ধন এভাবেই মানবতাকে জয়ী করেছে। আচার-বিচার, ধর্ম-সংস্কার এসব কিছু ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দুর মৃত্যুতে পাগল নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। ইন্দুর চিতার উপর উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ‘ছুঁসনে ছুঁসনে’ বলে তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণিভেদ, জাত-পাতের অস্পৃশ্যতাকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন লেখক। এই সমাজ ব্যবস্থার রূপ চর্যাপদের কাল থেকে আধুনিকতার উত্তরণ এই পর্বেও আমরা লক্ষ করেছি। সমাজ সেই সময় যেখানে ছিল আজও আমরা সেই তিমিরেই আছি। আমিরের হৃদয়ের চাওয়াটাই তাই রূপ-তৃষ্ণার কাছে বৈষ্ণবীয় ঢঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে হাহাকারের ক্রন্দন ধ্বনি নিয়ে।

‘পরাণ মন্ডল’ গল্পে মামুদপুর গ্রামের কৃষক পরিবারের কথা উঠে এসেছে। গল্পটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’ গল্পের একটু আধটু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে গল্পকার বেছে নিয়েছেন মুসলমান সমাজকে এবং ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্তকে তুলে ধরেছেন।

হারু মন্ডলের দুই ছেলে পরাণ ও সাত বছরের নয়ান। হারু মন্ডল ও তার স্ত্রী ওলাদেবীর কারণে মারা যায়। এরূপ অবস্থায় পরাণের স্ত্রীর উপর সাংসারিক দায় দায়িত্ব বর্তায়। পরাণ উদায়স্ত খেটে সংসারের হাল ধরলেও সময়মত ছোট ভাইটির খবরাখবর নিতে পারেনি। স্ত্রীর কড়া মেজাজের সামনে পড়ে পরাণের ভাইটির অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। পরাণ পথের ধারে অভুক্ত অবস্থায় নিজের ভাইকে দেখতে পেয়ে হিতাহিত জ্ঞান বিচার না করেই নিজের স্ত্রীর মুণ্ডু ছেদ করে। আদালতে দাঁড়িয়ে সেকথা স্বীকারও করে নেয়। তবে তার কৃতকর্মের জন্য সে এতটুকুও অনুতপ্ত নয়। ভাইয়ের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে এমন নিষ্ঠুর নৃসংস হত্যা তার উগ্র স্বভাবকেই যেন প্রকাশ করেছে। পরাণের কথাতেই –

“এতটুকু খানি ছাওয়াল, মা নেই, বাপ নেই, তারে কুকুরডার মত এই দুপুর বা’র করে দিল। ... একটা ভাই; তারে কিনা তাড়ায়ে দিল। একটা দানা দিল না, লাথি মারলো।”[১০]

পরান জানে যে একজন খুনির সাজা কি হতে পারে। তাই শেষবারের মত নিজের ভাইটিকে একটি বার দেখতে চাওয়ার আর্জি জানিয়েছে জর্জ সাহেবের কাছে।

সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বিশ্লেষণ মানুষের আত্মমনের দুর্বিষহ যন্ত্রণাই এই গল্পে তীব্রতর হয়েছে। কৃষক পরিবারের সমস্যা, বিশেষত কৃষিকাজেও যখন অভাব মেটানো তখন অন্যের জমিতেই শ্রমিকের কাজ করতে দেখি কৃষক প্রজাকে। আবার কখনো বা ঘরামির কাজ নিতে দেখি। অর্থ উপার্জনে সাধারণ কৃষক পরিবার এভাবেই সচেষ্ট থেকেছে কৃষি-শ্রমিকের মাধ্যমে রোজগারের জন্য।

পল্লী বাংলায় সময়ের সাথে সাথে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ও চেহারার আমূল পরিবর্তন

ঘটেছে। ছোট পরিবার তন্ত্রের মধ্যে মানুষ বিশ্বাস রেখেছে। পরানের স্ত্রীর স্বভাবগত দিক ও পরানের ছোট ভাইয়ের উপর আক্রোশ যেন সেই পথেই আমাদের নিয়ে গেছে। উনিশ বছরের বধূটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে খুব সহজে গল্পকার এই প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন। তবে তার বুদ্ধির গতিটা 'সু'-র দিকে যায়নি, 'কু'-র দিকেই গেছে। এতকাল সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি 'বাঘের মত শ্বশুর ও বাঘিনীর মত শ্বাশুড়ি' থাকার কারণে। তাই তাদের মৃত্যুর জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছে। তাদের মৃত্যু ঘটতেই বধূটি সাংসারিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে যেন হাপ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু পরাণের সাত বছরের ছোট ভাইটিকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। বিনা কারণেই গালিগালাজ দিয়েছে এমন কি অভুক্ত রেখেছে। সামান্য একটু বিষয়কে নিয়ে দিনকে দিন পরাণের ভাইয়ের ওপর নির্যাতন চালিয়ে গেছে। গল্পে ঘটনার ক্লাইমেক্স আনতে লেখক এই ঘটনা ক্রমকে বেশ কয়েকটি পর্বে বর্ণণা করেছেন। আমরা চুড়ান্ত মুহূর্তে যাওয়ার পূর্বে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সেই চিত্রটি গুরুত্বানুসারে পরপর নিম্নে তুলে ধরছি-

ক। 'ওরে হাড়হাবাতে পুকুর ঘাট কি জমের বাড়ি? এমন বজ্জাত, কুড়ে ছেলেও দেখিনি।'

খ। 'লাবাবজাদার আর ঠাং চলে না, পুকুর কি সাতক্রোশ রে কুড়ে!'

গ। 'তবে রে হারমের পুত' ... ন্যকামি। ওঠ বলছি, নইলে তোর গোস্ত টুকরো টুকরো করব।'

ঘ। 'বেরো আমার বাড়ি থেকে। আর যদি এবাড়িতে ঢুকবি তাহলে তোরে খুনই করে ফ্যালব।'

এমন হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুরতার প্রকাশে গল্পকার একদিকে চরিত্রটির নিষ্ঠুরতার বর্ণণা যেমন করেছেন, তেমনি আবার গল্পের পরিণতি ও ঘটনা প্রবাহকেও চূড়ান্ত ক্লাইমেক্স-এর স্তরে নিয়ে গেছেন। ফলস্বরূপ আমরা তাই পরাণের স্ত্রীর মৃত্যু এবং পরান মন্ডলের নিষ্ঠুর রুদ্ররূপের পরিচয় পেয়েছি। সামান্য বিষয়কে নিয়ে রচিত হলেও গল্প তাই সবশেষে চমকপ্রদ হয়েছে।

'নসীবের লেখা' গল্পে সাধু সেখ, সাধু সেখের স্ত্রী এবং তাদের একমাত্র পুত্র অলিমদ্দীকে নিয়ে গল্পকার সুনিপুনভাবে দেখিয়েছেন জমিদারের ভয়াবহ রূপকে। দোর্দন্ডপ্রতাপ জমিদার প্রজাদের শায়েস্তা করতে সাধু সেখের মতই ডাকাবুকো লাঠিয়াল মানুষ জনকে সঙ্গে নিয়েছে। এক্ষেত্রে জমিদার রক্ষকরূপে ভিটে-মাটি, জমি-জমা দিয়ে সাধু সেখের মত লাঠিয়ালদের দ্বারা নিজের নিরাপত্তাকে জোড়দার করেছে। কিন্তু বিবাহের পর সাধু সেখের জীবনে আসে আমূল পরিবর্তন। হিংসা ছেড়ে শান্তিতে জীবন-যাপনের জন্য কৃষিকাজকেই বেছে নেয় সাধু। এভাবেই চরিত্রটি বিবর্তিত হয়।

গল্পের Climax সাধু সেখের মৃত্যুর পর শুরু হয়। একমাত্র পুত্র অলিমদ্দীর অকর্মতার জন্য জমিজমা কিছুই আর রক্ষা করা যায় নি। অগ্যতা নাবালক পুত্রের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সাধু সেখের স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের পথকেই উপায় স্বরূপ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। জমিদারের ষড়যন্ত্রে সেখ এই সুযোগে ভালোমানুষি স্বভাবের ছল করে সমস্ত কিছুই নিজের করে নিয়েছে। এরপর মাতা-পুত্রের উপর কারণে-অকারণে গালি-গালাজ করে ভিটে ছাড়া করেছে। অন্যের গৃহে অলিমদ্দী কাজ নিলেও সে ষড়যন্ত্র করেছে এবং মিথ্যে চোরের অপবাদে কর্মচ্যুত করেছে। সাধু সেখের স্ত্রী জমির সেখের ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করলেও বেজন্মার ছেলে রূপে অপবাদ শুনতে চায়নি। মাতৃত্বের অবমাননায় প্রতিবাদে সরব হয়েছে –

"খবরদার অমন কথা আর মুখে এন না, সাবধান ক'রে দিচ্ছি কি বলব তোমাকে, আল্লার নাম নিয়ে নিকে করেছি, নইলে আর কেউ একথা বলে এতক্ষণ এই বাঁ-পায়ের লাথি দিয়ে তার মুখ ভেঙ্গে দিতাম।"[১১]

সাধু সেখের স্ত্রী যথাযথই ভদ্র-রুচিসম্মত, কোমল স্বভাবের। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কখনই হঠকারিতা বা উগ্রতা লক্ষ করা যায়নি। আসলে নারী চরিত্রের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যই হল কোমলতা; কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গলে তারাই প্রতিবাদে সরব হয়েছে। সাধু সেখের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মত হওয়ার পিছনেও তার যুক্তি, বিচার-বুদ্ধি ছিল। প্রথমতঃ নাবালক পুত্রের বিষয় আশয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করা। দ্বিতীয়তঃ আস্থা বা নির্ভরতা। কিন্তু নিজের এই সিদ্ধান্তে যে সম্পূর্ণ উল্টো তা পরবর্তীতে সে (সাইসেখের স্ত্রী) বুঝতে পেরেছে। একমাত্র পুত্র আলিমও বারণ করলে শোনেনি। বলেছে 'তর ভালর জন্যই একাজ করছি এতে তোর একটা হিল্লে হবে, নইলে যা কিছু আছে সব বেহাত হ'ইয়ে যাবে।" (নসীবের লেখা, পৃঃ ১০৯)

মাতা-পুত্রের এই বোঝাপড়াই আমাদের কাছে গল্পটির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, আলিমের মা যে কথা ভেবেছে তা হয়নি, বরং সব কিছুই বেহাত হয়েছে। জমির জমিদার নায়েবের সঙ্গে যোগাসাজুয্য করে সাধু সেখের সমস্ত জমি-জমা নিজের নামে বন্দ্যোবস্ত করে নিয়েছে। মিথ্যে খাজনার অজুহাতে সবকিছু হস্তান্ত্রিত হয়ে গেলে নিরুপায় নারী অপমান, অকথ্য গালিগালাজ সহ্য করে গেছে। অবস্থার সংকট দেখে আলিমকে অন্যের গৃহে রাখালির কাজে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু জমির ষড়যন্ত্র করে মিথ্যে অপবাদ দিলে সে কাজ থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে। তবে সতীনারী কঠিন পরীক্ষায় জামিরের নিষ্ঠুরতা কদর্যতাকে সহ্য করলেও পারেনি নিজের সন্তানের নামে গালিগালাজ শুনতে। তাই অকুণ্ঠচিত্তে প্রতিবাদ করেছে। অন্ধকারে জামিরের গৃহ ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে। কারণ জামির শুধুমাত্র তাকে নয় সমগ্র নারীত্বের প্রতিই যেন বিদ্রুপ করেছে। সাধু সেখের স্ত্রী তাই বলতে পেরেছে –

"তুমি আজ যে কথা বলেছ, তাতে যে রাগ করবে না, তাকে আমি মেয়ে মানুষই বলি না।" (পৃঃ ১২২)

আর এমন কথাই প্রমাণ করে দেয় অন্য একনারী তথা অন্য এক প্রতিবাদী নারীর স্বরূপ কে। মুসলিম সমাজে নারী চরিত্রের এমন রূপ সচরাচর গল্পকারক উল্লেখ করেননি। কিন্তু জলধর সেন সেই দুঃসাহসিক কাজটি করেছেন প্রতিবাদী নারীর আত্মপ্রকাশে।

'পরান মন্ডল' তথা 'নসীবের লেখা' গল্পে নারী চরিত্রের বিচারেও আমরা দুই পরস্পর ভিন্নতার রূপ পেয়েছি। পরানের স্ত্রী নিষ্ঠুরতা এবং অপর দিকে 'নসীবের লেখা' গল্পে পুরোপুরিই শান্ত, রাগ-ক্ষোভ যন্ত্রণাকে যে মুখ বুঝে সহ্য করেছে। এই গুন পরাণের স্ত্রীর মধ্যে দেখিনি। আরো একটি মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে এই গল্পদ্বয়ে একদিকে পরাণের ভাই অপরদিকে সাধু সেখের ছেলে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও মুসলিম অসামঞ্জস্যের রূপ-চিত্রন এখানে লক্ষ করা গেছে। আমরা পূর্বাপর ঘটনা প্রবাহের নিরিখেও মুসলিম সমাজের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যেমন পেয়েছি তেমনি নারী প্রকৃতির ভিন্নতার রূপটিও দেখেছি। তাই তুলনামূলক বিচারেও গল্পদুটি অনন্য হয়েছে।

স্বাধীনচেতা নারী তার আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে রাতের অন্ধকারেই গ্রাম ছেড়েছে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। গ্রাম্য কুসংস্কার তথা পল্লীগ্রামের ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ভেদা-ভেদ একের প্রতি অপরের কুৎসা রটনা, এসবই নিত্যকালের ঘটনা। তবে দারিদ্রতা, দুখে, পদাঘাতে লুণ্ঠিত হয়েও নারী বিদ্রোহ করেনি; কিন্তু অপবাদে নারী মন বিদ্রোহ তথা প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। ক্ষমতাহীন মানুষের মতই যেতে যেতে অভিষিক্ত করেছে। নাবালক পুত্রের সম্পত্তি কুক্ষিগত করার ফল যে ভালো হবেনা তাও বলে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক পর্বে গ্রাম্য সহজ সরল নারীর এই প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে এই

গল্প চমক সৃষ্টি করেছে। তবে একই সঙ্গে সমকালের অস্তিত্বকেও জানান দিয়েছে।

ছিন্নমূল সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সর্বদাই নিজেদের আখের গোছাতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভিন্ন সম্প্রদায় নয়, আপন সম্প্রদায়ের মানুষ জনই মেতেছে সংঘর্ষে ও সংগ্রামে। অস্তিত্বের সংকটে একশ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষের হাতে সর্বস্বান্ত হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে পথে নেমে এসেছে আরেক শ্রেণীর মানুষ, যারা পরিণত হয়েছে সর্বহারা শ্রেণীতে।

জলধর সেন তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মিলন ঐক্যের মাধুর্যে সমাজ সম্পর্কের বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আচারধর্মিতা তথা হিন্দু-মুসলিম সমাজকে চিত্রিত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যেহেতু তিনি কাঙাল হরিনাথের শিষ্য ছিলেন। তাই হরিনামের ভাবাদর্শেরও ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর মধ্যে। সেকারণেই গল্পগুলিতে বাউল ধর্ম বিশ্বাস ও বৈষ্ণবীয় প্রেমরসের ভক্তি ভাবকে গল্পের বিষয়-পটচিত্রনে বর্ণনা করেছেন। 'পাগল', 'বিচার' গল্পে তারই দৃষ্টান্ত রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম জাত পাতের শ্রেণী দ্বন্দ্বের বিচারে শ্রেণী চরিত্রের এমন সহাবস্থানের কারণেই একটা ঐক্যভাব জলধরের গল্পে এসেছে। ১৯০০-১৯৪৭ এই কালপর্বে সামাজিক দুর্বলতা এবং সম্প্রদায়ের ভেদ-বিভেদের রাজনীতি লুঠতরাজ দেখা গিয়েছিল। অখণ্ড বঙ্গ সেদিন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নিয়েই দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতাময় খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রবল সেই তরঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। জলধর সেন তাঁর গল্পে অচেনা সেই ছবির বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন বাউল গানের মাধ্যমে। যেমন 'পাগল' গল্পের নায়ক আমির মন হারিয়ে ঘাটে গিয়ে কান পেতে শুধু শুনেছে –

"একদিনও না দেখিলাম তারে,
আমার ঘরের কাছে আরশি নগর,
তাতে এক পড়শি বসত করে।" (পৃঃ ১৪)

'বিচার' গল্পেও লেখক কাঙাল হরিনাথের দু-দুটি গানের প্রয়োগ করেছেন। প্রথম গানটি –

"তোমার প্রেমপাথারে যে সাঁতারে তার মরনের
ভয় কি আছে?"

এবং দ্বিতীয় গানটি –

"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে,
ওরে, ত্যা দুভাই এসেছেরে।
যারা মার খেয়েও হরি বলে
এসেছে রে।"

এই গানগুলি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অটুট বন্ধনে তথা মৈত্রী ভাবের কেন্দ্রে সম্পর্কের বন্ধনকে নিবিড়তর করেছে।

আসলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের জন্য জলধর সেন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বন্ধনকে 'ভাই ভাই' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং সনহকীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তে সহনশীলতা ও ঐক্যস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। তৃতীয়ত ধর্মীয় কুসংস্কার সংকীর্ণতা থেকে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। চতুর্থত বাস্তব ও কাল্পনিক ভয়, আত্ম অনুশোচনা থেকে স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা করেছেন। তাই অখণ্ড বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম সৌভাতৃত্ববোধ, শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথকে প্রশস্ত করেছেন।

সব মিলিয়ে জলধরের গল্পে মুসলমান সমাজ ও চরিত্ররা ধারাবাহিকতার পথ ধরে এসেছে। হৃদয়গ্রাহী প্রেম তথা ভ্রাতৃপ্রেম এবং জমিদারের লাঠিয়াল তথা সুবিধাবাদী চরিত্র এবং মুসলমান ফকির সবাই নিম্নমধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক বিপর্যয়তাকেই চিহ্নিত করেছে। পিতা-মাতার কাছে উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন অক্ষম হয়েছে। দেশে আজন্মা দেখা দিলে, ফসল না ফললে কৃষক পরিবারের সদস্যরা কৃষিকাজেই শুধুমাত্র নিজেদের নিযুক্ত রাখে নি। প্রয়োজনের তাগিদে অন্যত্র জনমজুরও খেটেছে – এই দৃশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধও তৎকালীন সময়ের সাথেই তুলনীয়। প্রতিহিংসার কারণে পরিবার পরিজনরা

দুর্বিষহ বিপাকে পড়েছিল এমনতর প্রমাণ পাওয়া যায় 'নসীবের লেখা' ছোটগল্পটিতেও।

সুতরাং জলধর সেনের গল্পের মুসলিম সমাজ ও চরিত্ররা যে কথা বলতে চেয়েছে তা সময়েরই রূপ চিত্রণ। ব্যর্থ জীবনের কাহিনীকে সমাজ প্রেক্ষিতে সুনিপুণভাবে সাজিয়েছেন গল্পকার। গল্পগুলির স্নিগ্ধতা, মাধুর্যতা, সংযমবোধ এবং অভিজ্ঞতা সজ্ঞাত বিশয়বস্তু পাঠককেও মুগ্ধ করেছিল। ভাষার সংযমবোধ, প্রাঞ্জল কথ্যরীতি এবং সাধুভাষার প্রয়োগে চরিত্রের তথা তৎকালীন সময়-সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীগত দিক এবং স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের বিরোদ্ধে তীক্ষ্ম বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে এই সকল গল্পগুলি। তাই অপরিচিত জগতের কথাকার জলধর সেনকে আজও বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রাণপুরুষ রূপে সাহিত্যে স্থান করে দিতে হয়, স্থান করে দিতে হয় অন্য স্বাদের গল্পকার রূপে।

তথ্যসূত্র :

১। সেন সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ট মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ৪৫।
২। মিশ্র ড. সুবিমল, সংকলন ও সম্পাদনা, *জলধর সেনের নির্বাচিত গল্প*, বাণী প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১২।
৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।
৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮।
৫। পূর্বোক্ত।
৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১।
৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮।
৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪।
৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।
১০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪।
১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২।

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়